মিলিটারি একাডেমির ডায়েরি

উৎসর্গ

বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার আবু হোসেন

আমার পিতা

তাঁর ইচ্ছায় সামরিক বাহিনীতে যোগদান করলেও, তিনি আমার উত্থান বা পতন কোনটাই দেখে যেতে পারেন নাই

অনলাইনে অর্ডার করতে
http://nalonda.com.bd

কলকাতায় পরিবেশক
বইবাংলা
স্টল ১৭, ব্লক ২, সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫ (কলকাতা)

মিলিটারি একাডেমির ডায়েরি	রাজীব হোসেন
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
স্বত্ব	রাজীব হোসেন
প্রচ্ছদ	সজল চৌধুরী
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	৮০০.০০ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক

©	Writer
Militari Academy Dairy	Raib Hossain
Cover Design	Sazal Chowdhury
First Pubished	February 2024
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar (Mannan Market) 2nd Floor, Dhaka 1100
Price	800.00 Tk only
ISBN	978-984-98484-0-0
E-mail	nalonda71 @gmail.com

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান। সারা পৃথিবী হতে বিভিন্ন দেশের সদস্যরা এখানে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে আসেন। এই একাডেমীর গ্র্যাজুয়েট হয়ে তাঁরা নিজ দেশে সামরিক বাহিনীকে সমৃদ্ধ করেন। চট্টগ্রাম ভাটিয়ারীর ছবির মতো সুন্দর পরিবেশে একাডেমীর কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

বর্তমানে এখানে অনেক পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমীর প্রশিক্ষণ এখন তিন বছর মেয়াদী যা আমাদের সময়ে দুই বছর ছিল। আমি আমাদের সময়ের আঙ্গিকে গল্পকে উপস্থাপন করেছি।

মিলিটারি একাডেমি ডায়েরি লেখা হয়েছে, আমি সামরিক বাহিনীতে অফিসার হিসাবে কমিশন পাওয়ার দুই যুগ পর। সে কারণে এখানে বহু ক্ষেত্রে তথ্যগত জড়তার সম্মুখীন হয়েছি। সমসাময়িক বন্ধুদের সাহায্য নিতে হয়েছে, কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। অন্যথায় বইতে বর্ণিত গল্পের সময় ফুটিয়ে তোলা কঠিন হয়ে পড়তো।

এই বইয়ের প্রথম পাণ্ডুলিপি লেখা হয় ২০২৩ সালের পুরোটা সময় ধরে। দুর্ভাগ্যক্রমে ল্যাপটপে সংরক্ষিত সেই পাণ্ডুলিপি, হার্ড ড্রাইভ ক্র্যাশ করায় হারিয়ে যায়। এটি আমার জন্য একটি বড় মাপের বিপর্যয় ছিল। ২৬ নভেম্বর ২০২৩ থেকে পুনরায় একই পাণ্ডুলিপি লেখা শুরু করে, নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে শেষ করে বই প্রকাশ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দেয়। মাত্র ৪৫ দিনের ভিতরে গোটা পাণ্ডুলিপি শেষ করে প্রকাশকের হাতে তুলে দিতে যেয়ে, আমাকে তাবৎ সামাজিকতার ঊর্ধ্বে উঠে অনেক বেশি শ্রম দিতে হয়েছে। প্রকাশকের অবিরাম তাগাদা, পাঠকের উৎসাহের পাশাপাশি, আমার স্ত্রী কিয়ার ঐকান্তিক সহযোগিতা এবং অনুপ্রেরণায় সেই কাজটি সম্ভব হয়েছে। অফিস থেকে ফিরে প্রতিদিন লেখালেখি নিয়ে বসলে, তিনি বিরক্ত না হয়ে বরং গরম চা বানিয়ে পরিবেশন করেছেন।

আমি সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেছিলাম মূলত আমার প্রয়াত পিতার তীব্র ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখিয়ে। তিনি একজন রনাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা, প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ এবং গণমানুষের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর একমাত্র পুত্র তাঁর পদাংক অনুসরণ করে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করুক। কিন্তু আমার পরম দুর্ভাগ্য, আমার অফিসার হিসাবে কমিশন প্রাপ্তির পূর্বেই আব্বা একটি সড়ক দুর্ঘটনায় পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। এই আফসোস আমি জীবনভর বয়ে বেড়াই।

ক্যাডেট কলেজ, বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি কিংবা সামরিক বাহিনীর জীবন, এই সকল প্রাঙ্গনে আমার পৌঁছানো এবং নিজের উৎকর্ষতা অর্জনের যে নিরন্তর চেষ্টা, তার পিছনে আমার মায়ের অবদান রুপকথার গল্পকেও হার মানায়। দেশকে মা ভাবলে তাই, দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে কাজ করা সহজ হয়।

বইতে ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে, যা হয়তো চাইলে এড়িয়ে যাওয়া যেত। একইভাবে কিছু গল্প বলা হয়নি যা হয়তো চাইলে তুলে ধরা যেত। গল্পের ধারাবাহিকতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে যেয়ে, আমি নিজের মতো করে গল্পগুলো সাজিয়েছি।

এই বইতে অনেক ক্ষেত্রে সমার্থক বাংলা শব্দ ব্যবহার না করে ইংরেজি শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন করা হয়েছে। মিলিটারি একাডেমিতে প্রচলিত শব্দ, কথ্য ভাষায় যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, আমি লেখার ক্ষেত্রে গল্পের আয়োজন অটুট রাখার জন্য ঠিক একই ধাঁচে শব্দসমূহের প্রয়োগ করেছি। একাধিক স্থানে ইংরেজি বাক্য বাংলা হরফে লিখেছি।

গল্পের যোগসূত্র খুঁজতে গিয়ে অনেক কোর্সমেটদের স্মৃতির দ্বারস্থ হয়েছি। রুম্মান এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সময় দিয়েছে। বিশেষ করে কোর্সের অনেক মজার ঘটনা ওর বয়ানে উঠে এসেছে। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হাসিব একাধিক সেশনে সময় দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে।

আমার নিয়মিত এডিটর স্নেহের অনুজ সিদ্দিকুল আবেদিন হামিম এই বইয়ের চূড়ান্ত সম্পাদনা এবং সমন্বয় করেছেন। হামিমের চেয়ে আমার লেখা আর কেউ সহজভাবে আত্মস্থ করতে পারে বলে আমার মনে হয় না। প্রিয় সহকর্মী ফায়েজ, অলংকরণের কাজে সহায়তা করেছেন। এদিকে লেখকের চিন্তাকে সুন্দর একটি প্রচ্ছদের রুপ দিয়েছেন সজল চৌধুরী। তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ!

আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে সামরিক বাহিনীতে আমি ৪৫ এবং ৪৬ বিএমএ লং কোর্সের সদস্য। আমার কোর্সমেটদের অধিকাংশ এখন দীর্ঘ সার্ভিস শেষ করে উচ্চতর অবস্থানে রয়েছেন। তাঁদের সাথে আমার যোগাযোগ একেবারেই সীমিত। তবে তাঁদের প্রত্যেকের সাফল্য এবং উত্তরণের সংবাদে আমি শর্তহীনভাবে আনন্দিত হই।

মিলিটারি একাডেমি থেকে বেরিয়ে আসার দুই যুগ এবং সামরিক বাহিনীর অধ্যায় সমাপ্তির দেড় যুগ পরেও আমার গুটিকতক ইন্সট্রাক্টর আমাকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করেন। তাঁদের কাছে শেখা বুদ্ধির চর্চা, বাগ্মিতা, সমানুভূতি (এমপ্যাথি), মনোবলে দৃঢ়তা আর কঠোর অধ্যবসায় আজও আমার চলার পথকে সহজতর করে তুলে। ৪৫ বিএমএ লং কোর্সের মেজর নুরুল মান্নান আমাদের তারুন্যের প্রিয় নায়কোচিত সামরিক অফিসার। মেজর আক্তার, ক্যাপ্টেন সাদাত, মেজর ইমরান আমাদের পিতৃতুল্য স্নেহ দিয়েছেন। ৪৬ বিএমএ লং কোর্সের মেজর মোয়াজ্জেম, মেজর সাইফ আমার স্মৃতিপটে আমৃত্যু সেই সুদর্শন এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তরুন অফিসার হয়েই রবেন।

আমার সেকেন্ড টার্মের প্লাটুন কমান্ডার আর্মি এভিয়েটর মেজর মিজান না থাকলে, আমি হয়তো মিলিটারি একাডেমিতে সেকেন্ড টার্মের চৌহদ্দি পাড় হতে পারতাম না। একজন সামরিক কর্মকর্তা এবং দূরদর্শী প্রশিক্ষক হিসাবে তিনি আমার কাছে চিরপূজনীয় ব্যক্তিত্ব।

৪৬ বিএমএ লং কোর্সের টার্ম কমান্ডার মেজর শামিম কামাল আমার জীবনের এক সন্ধিক্ষণে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আমার সাথে অত্যন্ত আন্তরিক কণ্ঠে তিন মিনিট কথা বলেছিলেন। সেই তিন মিনিটের জন্য তিনি সারা জীবনের তরে আমার শ্রদ্ধা অর্জন করে নিয়েছিলেন। আমার তরুন বয়সে তিনি আমায় মানবিকতা এবং সহমর্মিতা শিখিয়েছিলেন।

আর আমার প্রশিক্ষক মেজর রিয়াজ মানুষ হিসাবে আমাকে বিস্মিত করেছেন। তিনি আমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন, এৎবধঃহবংং রং ধ পযড়রপব! আমি আমার গোটা জীবনে তাঁর মতো সোনার মানুষ খুব কম দেখেছি।

আমার প্রিয় শিক্ষক লেফটেন্যান্ট কর্নেল বশিরউদ্দিন বর্ণাঢ্য কর্মজীবন শেষে এই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে গেছেন। ক্ষুদ্র এক খণ্ড ভূমিতে তাঁর সাথে পরিচয় শেষে, তিনি আমায় মহাসাগরের প্রান্তদেশ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। একজন প্রকৃত শিক্ষকের এমনই মাহাত্ম্য!

যে সকল তরুন বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমীতে যোগদান করে ট্রেনিং সম্পন্ন করে অফিসার হয়েছে; যে সকল তরুন বিএমএ-তে ক্যাডেট হিসাবে যোগদান করেও,যেকোনোকারণে ট্রেনিং সমাপ্ত করতে পারে নাই; যে সকল তরুন আইএসএসবি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে; যারা ভালোর পক্ষে থেকে দেশসেবা এবং সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে, সেই সকল যুবক; এবং ৪৫ বিএমএ লং কোর্স ও ৪৬ বিএমএ লং কোর্সের সকল অফিসার- "মিলিটারি একাডেমির ডায়েরি" বইটি আপনাদের জন্য লেখা।

সবার ভালো হোক।

রাজিব হোসেন

১২ জানুয়ারী ২০২৪

সূচিপত্র

সহজাত লক্ষ্য এবং জীবনের বহমানতা
প্রথম ধাপঃ ক্যাডেট কলেজ
ইন্টার সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড
ক্যাডেট কলেজ থেকে মিলিটারি একাডেমির পথ
অল্পের জন্য বিমানের ফ্লাইট মিস হয়ে গেল
ক্যাডেট কলেজ পরবর্তী জীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহনে অনিশ্চয়তা
আইএসএসবি পরীক্ষার ঘটনাবলী
মিলিটারি একাডেমিতে যোগদানের প্রস্তুতি সময়

বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি
ফার্স্ট টার্ম
একাডেমিতে যোগদান পর্ব (সিভিলিয়ান হিসাবে শেষদিন)
মিলিটারি একাডেমির অভ্যর্থনাঃ উত্তর গোলার্ধের দীর্ঘতম রাত
ক্যাডেট ব্যাটালিয়নে কোম্পানি লাইনের মাধুর্য
টাচিংদ্যহোয়াইটওয়াল
যদি নাও ভালো লাগে তবু খেয়ো গাঁদা ফুল
প্লাটুনের সহকর্মীরা এবং নতুন পরিবেশে জীবনের শুরু
ফার্স্ট টার্মের কঠিন রুটিন
মর্মান্তিক ওয়ার্মিং আপ প্যারেড এবং এত সুর আর এত গান
মিলিটারি একাডেমির প্রাতিষ্ঠানিক শাস্তিসমূহ
লোকাল বিএসএম, সকালের নাস্তা বিদ্বেষ এবং ডাকপিয়নের ছুটি
ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের বড় ভাইয়েরা
বিদায় গোল্ড লিফ
শক ইফেক্ট ইজ রিয়েল
মোহনীয় ত্বকের জন্য চাই, ঝামা ইট দিয়ে শেইভ
ফায়ারিং এবং বাবুল লেইক
পদক্ষেপ এক্সারসাইজ, সিটিপাশেসুস্বাদুখাবারএবংকোর্সফলিন
অপারেশন “চামচ দিয়ে বালতি ভরাট করা”
আন্ডি প্যারেড
সিটি পাশ শুরু
কোকাকোলা, লোকাল বিএসএম এবং একটি দুর্ঘটনা
ফার্স্ট টার্ম শেষ হয়ে আসে

সেকেন্ড টার্ম
নতুন রুমমেট, নতুন ট্রেনিং কার্যক্রম
দুই মাইল দৌড় শুরু এবং জাহিদের পিঠ দেখার মাহাত্ম্য
দশ পেতে হলে জাহিদের পিঠ দেখতেই হবে
সিক্স জিরো থ্রি থ্রি নাকি ডাবল থ্রি
হাত ফস্কে আলুর দম
বক্সিং উইথ দ্য অড হ্যান্ড
ফাইট অ্যান্ড ডাই ইনসাইড দ্য বক্সিং রিং
রাতের রেইড এবং মাইরের উপর ওষুধ নাই
নাহিদের ব্লাড টেস্ট

এক্সারসাইজ ডিফেন্স
এক্সারসাইজ যেমনই হোক, টাইটস হতে হবে রঙে রঙিন
যদি থাকে নসিবে, আপনি আপনি আসিবে
দ্য ব্রুটালি লং নাইট
সারভাইভার্স অফ দ্য গ্রেট ডেপথ সেকশন
ঝড়ের পরে
সিটি পাশ এবং চিটাগাং শহর
বন্ধু সারফরাজ এবং মন ভালো করা স্মৃতিময় শহর
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
সেরেমনিয়াল ড্রিল এবং লক্ষ্যের পানে আরেক ধাপ এগিয়ে যাওয়া

থার্ড টার্ম
অবশেষে আলফা যুগের অবসান
ড্রিল বিপিটি বনাম বিপিটি ড্রিল
ডোন্ট এভার গো বিহাইন্ড এ হর্স এন্ড ইনফ্রন্ট অফ এ সিনিয়র
কর্পোরাল তারেক দ্য লিজেন্ড, বিশেষ সংশোধনী (কারেকশন) এবং ভুলের মাশুল
ভাগ্যিস তোষক আগেই সরিয়েছিলাম
“সো হোয়াট” স্ক্যান্ডাল
অন্যের প্রশংসা করতে পারা একটি মহৎ গুণ
গার গার গার গার মুস্কিলা
মাই মোস্ট ফেভারিট টেলিভিশন এক্টর
এক্সারসাইজ কষ্টিপাথর (এসিড টেস্ট)
কার বেশি গুরুত্ব? হেলমেট নাকি কমফোর্ট?
ফাইনাল অ্যাটাক (ডন অ্যাটাক)

সেরেমনিয়াল ড্রিল
নাসা মহাশুন্য ষ্টেশন থেকে কবির স্টাফের কণ্ঠ শোনা গেল
নতুন দায়িত্ব এবং সময়ের প্রয়োজনে

ফাইনাল টার্ম(৪৫ বিএমএ লং কোর্স)
সমাপ্তির কাছাকাছি এবং হেল কমান্ডো
৪৮ লং কোর্স যোগদানের রিসেপশন
হাউ কাম! হাউ কাম!
সেধে এক্সট্রা রোল কল (ইআরসি) ম্যানেজ করা, অতঃপর
ইন্টার কোম্পানি ইংলিশ ডিবেট কম্পিটিশন উইন্টার টার্ম ২০০১
হোয়াট মেকস ইউ এ জেন্টেলম্যান?
টাই কাহিনি

এক্সারসাইজ লালঘোড়া
লাল ঘোড়ার শুরুর দিন ঝুম বৃষ্টি এবং এ বিগ হোল
স্যার, আমি খাইতেয়াসি
ক্লান্ত লালঘোড়া ক্যাডেট ব্যাটালিয়নে ফিরে আসে
আম্মার চিঠি
আব্বা বিএমএ বেড়াতে এলেন
বিএসসি পরীক্ষা
গাড়ির জরুরি সেবা ঠিক আছে, কেবল দিক নির্দেশনায় গোলমাল
ফাইনাল টার্ম এসিড টেস্ট
ব্যাটেল ইনোকিউলেশন (বি আই)
বশির স্যার শেষ ক্লাসে আমার ভুয়সি প্রশংসা করেন
কমিশন্ড অফিসার হিসাবে পাস আউট করার জন্য সেরেমনিয়াল ড্রিলের প্র্যাকটিস শুরু হল
দুর্ভাগ্য অতর্কিতে হানা দিল
তীরে এসে তরী ডুবে যায়
একজন ক্যাডেটের পাপ এবং গুরুতর দণ্ড
আব্বা আম্মার দুর্ঘটনা
বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার আবু হোসেন দৃশ্যপট হতে বিদায় নিলেন
আমি একাডেমিতে ট্রেনিং করতে ফিরে গেলাম

ফাইনাল টার্ম (৪৬ বিএমএ লং কোর্স)
আমার জন্যে আলো জ্বেলো না কেউ, আমি মানুষের সমুদ্রে গুনেছি ঢেউ
মহান হৃদয় প্রশিক্ষকবৃন্দ
বাংলা বিতর্ক প্রতিযোগিতাঃ নিজের অজান্তেই বিএমএ রেকর্ড হল
মন আমার দুই নম্বরি, ভাটিয়ারী, বিএম ট্রেনিং করতেয়াসে
শেষমেশ রেস্ট্রিকশনের হাত থেকে আর বাঁচা গেল না
হারপিক আনো, হারপিক দিয়ে সমুচা খাব
লালঘোড়া দ্বিতীয়বারের মতো লাল ভাবি আনতে যায়
নতুন এলাকায় ব্যাটেল ইনোকিউলেশন
সো প্লিজ টেল মি, হোয়াই আর ইউ রেলিগেটেড?
তৃতীয় এসিড টেস্ট
সেরেমনিয়াল ড্রিলঃ দ্য ফাইনাল চ্যাপ্টার
নতুন সামরিক ইউনিটে যোগদানের পূর্বে অভ্যর্থনা
সার্জেন্ট আলকাসের অদ্ভুত বিদায়ী সম্ভাষণ
দ্য স্টোরি অফ গ্র্যাটিচিউড উইদিন ব্র্যাকেট
একাডেমিতে শেষ দিন
শেষের কথা

সহজাত লক্ষ্য এবং জীবনের বহমানতা

প্রথম ধাপ : ক্যাডেট কলেজ

আমি কোনোদিন সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চাই নাই। ক্যাডেট কলেজের ছেলেপুলেদের খুব স্বাভাবিকভাবে এই লাইনে চিন্তাভাবনা থাকলেও, আমার এক মুহূর্তের জন্যেও সামরিক বাহিনীতে ক্যারিয়ার করার ইচ্ছা হয়নি। আমার সাথে ক্যাডেট কলেজে যারা ছয় বছর ধরে এক সাথে বড় হয়েছে, তাঁদের বেশির ভাগ এখন পর্যন্ত বিশ্বাস করে না, আমি এক সময়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলাম। আমার হাউসের এক বন্ধু সবসময়ে বলত, "খন্দকার, তুই ক্যাডেট কলেজ থেকে বের হয়ে ঢাকা ভার্সিটিতে ভর্তি হবি। অবশ্যই তোকে বাংলা বিভাগে পড়তে হবে। নির্ভেজাল বাংলা সাহিত্যে পড়বি আর প্রেম করবি। এই তোর কাজ।"

আমি ওর এই কথা শুনে কেবল ভাবতাম, 'তাহলে আমার জীবিকা কি হবে! বাংলা সাহিত্য পড়া নাকি প্রেম করা?" উত্তর খুঁজে পাইনি। আমি নিজেই যেখানে উত্তরের অপেক্ষায়, আমার ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে ওদের এহেন দ্বিধার বিষয়ে আমি দোষ দিই না।

আমি ছোটবেলা থেকে খুব দুষ্টু ছিলাম। মুরুব্বিরা আমার আম্মাকে বলতেন, 'শৈশবে সবাই কমবেশি দুষ্টু থাকে। বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে!"

তবে বড় হতে হতে আমার দুষ্টুমির মাত্রা বেড়েছে, কমে নাই। শৈশবে আমার দুষ্টুমিতে অতিষ্ঠ হয়ে আমার দাদী মাঝে মাঝেই আম্মাকে বলতেন, "ও বউ, আমার নাতিরে একটা খাঁচায় ঢুকায়ে দাও।"

দাদীর সেই কথা বাস্তবে রুপ পায়, যখন আমি ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। সেই ভর্তি পরীক্ষা নিয়েও রাজ্যের কাহিনি।

ক্লাস সিক্সে পড়ার সময়ে আমাকে ক্যাডেট কলেজে এডমিশন পরীক্ষায় বসানোর পরিকল্পনা করা হয়। এই আলোচনাটি আমার আব্বা প্রথমে সামনে নিয়ে আসেন। যদিও আম্মা পুরো বিষয়টি নিয়ে শুরুর থেকেই দ্বিধান্বিত! তিনি মন থেকে চান, পুত্র বোর্ডিং স্কুলে না গিয়ে নিজের কাছে থাকুক। আবার ক্যাডেট কলেজে গেলে সার্বিক শিক্ষার বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারবেন। এখানে বলে রাখা ভালো, নব্বই দশকের শুরুতে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্যাডেট কলেজে পড়তে পারা, পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলে বিবেচিত হত। মানদণ্ডের দিক থেকে ক্যাডেট কলেজ ছিল অতুলনীয়! কেবল শিক্ষার কারনেই নয়, বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে তখন সন্তানকে একটি অর্থনৈতিক, সামাজিক নিরাপত্তার বলয়ে রেখে মানুষ করতে পারার জন্য, ক্যাডেট কলেজ একটি অত্যন্ত মানসম্মত প্রতিষ্ঠান ছিল।

শুরুতে আব্বার সাথে দ্বিমত পোষণ করলেও পরবর্তীতে দীর্ঘ আলোচনা করে, আম্মা নিজেও এই পরিকল্পনায় সায় দেন। শুরু হয় আমাকে ক্যাডেট কলেজ এডমিশন টেস্টে উত্তীর্ণ হবার জন্য তৈরি করে তোলার প্রচেষ্টা। সে সময়ে আমার নিজের জেলা টাঙ্গাইল শহরে একাধিক ক্যাডেট কোচিং সেন্টার খুব নাম সহকারে প্রসার জমিয়েছে। কোন এক অদ্ভুত কারণে এই নির্দিষ্ট এডমিশন পরীক্ষা ভিত্তিক কোচিং সেন্টারের জন্য আমার নিজের জেলা শহর বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। কিছু বন্ধু বান্ধবের সাথে আলোচনা করে আমার আব্বা সিদ্ধান্ত নিলেন, আমাকে শহীদ প্রি-ক্যাডেট কোচিং সেন্টারে ভর্তি করে দেওয়া উচিৎ। এরপর ঘটনাবলী খুব দ্রুত এগোল।

আমাকে একদিন জানানো হলো, অবিলম্বে আমি টাঙ্গাইল শহরে পাড়ি জমাচ্ছি। সেখানে আমি আমার ছোট খালার বাসায় থাকবো এবং শহীদ প্রি-ক্যাডেট কোচিং সেন্টারে পড়াশোনা করব। এই পড়াশোনা প্রায় ১০ মাস চলবে। এই সময়ে আমি স্কুলে ক্লাস করব না। মাঝে মাঝে ঢাকায় এসে কেবল পরীক্ষা দিয়ে যাব। কোচিং শেষ হলে আগামী বছর শীতের সময়ে আমার ক্যাডেট কলেজ এডমিশন পরীক্ষা হবে। অতয়েব হাতে সময় নেই। ঢাকার পাট দ্রুত চুকিয়ে আমি টাঙ্গাইল চলে যাব। আমার কাছে গোটা প্রক্রিয়া খুব মন খারাপের বলে মনে হলো।

আমি খুব মা ঘেঁষা ছেলে। অথচ এখন আমাকে মাসের পর মাস মা থেকে দূরে থাকতে হবে। এছাড়া আমার এতদিনের বন্ধু বান্ধব, পরিচিত পরিবেশ, স্কুলের মাঠ, এই সবকিছু ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। খুব মন খারাপ হলো। আমি সে সময়ে মতিঝিল উচ্চ বালক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করি। একে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টবয়েজ স্কুল বলে ডাকা হয়। অনেক পুরাতন স্কুল। মজার বিষয় হচ্ছে, আমার আব্বা নিজেও এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। আমার স্কুলে যেতে বেশি ভালো না লাগলেও, স্কুলের বিশাল খেলার মাঠ আমায় টানতো। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টবয়েজ স্কুলের মাঠ সম্ভবত ঢাকা শহরের অন্যতম বড় মাঠ। স্কুল শেষে কতদিন যে সেই মাঠে ফুটবল খেলেছি, তার ইয়ত্তা নেই। স্কুলের বন্ধুদের কাছে থেকে বিদায় নেয়ার পালা এলে রীতিমতো কান্নাকাটি করলাম। এরপর একদিন সকালে ব্যাগ ভরা কাপড় আর পড়ার বই নিয়ে, আব্বা এবং আম্মার সাথে আমি টাঙ্গাইল শহরে এসে পৌঁছালাম। আমার সেই তারিখটি আশ্চর্যজনকভাবে মনে আছে। এর কারণ, সেদিন সত্যজিত রায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

শহীদ প্রি-ক্যাডেট কোচিং সেন্টারে আমার দশ মাসের জীবন কেমন কেটেছে, সেই কাহিনি অনেক লম্বা। ঐ সময়ের গল্প অন্য কোন এক সময়ে, কেবলমাত্র ক্যাডেট কলেজ জীবন নিয়ে লেখা কোন অধ্যায়ের জন্য তোলা থাকল। আজ শুধু ক্যাডেট কলেজ এডমিশন টেস্টের দিন সকালের অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করি।

ক্যাডেট কলেজে 'ভর্তি পরীক্ষা' নামের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য কোচিং সেন্টার থেকেই আমাদের তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। শহীদ প্রি-ক্যাডেট কোচিং সেন্টার এক্ষেত্রে খুব গুছিয়ে কাজ করত। কোচিং সেন্টারে আমাদের

প্রায় দশ মাসের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে, সম্ভাব্য ক্যাডেট কলেজ নির্বাচন করা হত। সে সময়ে বাংলাদেশে একটি মহিলা ক্যাডেট কলেজ সহ মোট ক্যাডেট কলেজের সংখ্যা ১০। এর মাঝে সবচেয়ে পুরাতন কলেজ ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ। যদিও ঢাকা থেকে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ দূরত্বের বিবেচনায় সবচেয়ে কাছে এবং এই কারণে আমার বাবা মা এখানকার বিষয়ে খুব আগ্রহী ছিলেন। শহীদ প্রি-ক্যাডেট কোচিং সেন্টারের প্রধান শিক্ষক শহীদ স্যার চাইলেন, আমি যেন ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে পরীক্ষা দিই। অতয়েব আমি ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় এডমিশন টেস্টে অবতীর্ণ হচ্ছি। তবে ভর্তি পরীক্ষার কেন্দ্র, পরীক্ষার্থীর বর্তমান অবস্থানের কাছাকাছি কোথাও পছন্দ করে নেওয়া যায়। আমার বাসা ঢাকা এবং শহীদ প্রি-ক্যাডেট কোচিং সেন্টার টাঙ্গাইলে হওয়ার কারণে আমার পরীক্ষা কেন্দ্র মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ নির্ধারিত হয়েছে! শীতের আমেজ থাকতেই, আমাদের ভর্তি পরীক্ষার দিন ধার্য হলো।

আমরা সকাল সকাল পরীক্ষা কেন্দ্রে হাজির হলাম!

ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষে, আম্মা তাঁর সাথে বহন করা ব্যাগ হতে বিশেষ একটা ঠোঙা বের করলেন। সেখান থেকে সযত্নে দুইটা ইকোনো বলপয়েন্ট পেন বের করা হলো। আম্মার চোখেমুখে গাম্ভীর্য! তিনি আমার দিকে তাকালেন। আমি সাধারণের চেয়ে বেশি মনোযোগ সহকারে আম্মার কথা শোনার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি।আম্মা কথা শুরু করলেন।

আম্মাঃ বাবা এই কলম দিয়ে পরীক্ষা দিবা।

আমিঃ আম্মা, একটু লিখে কলমের নিব মসৃণ করে নেওয়া তিনটা কলম আমার সাথে আছে। এখন নতুন কলম দিয়ে লেখা ঠিক হবে না। সময় নষ্ট হবে।

আম্মা: আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার কথাই থাকলো। তবে প্রশ্নের উত্তর যেই কলমেই লিখো, সময় পেলে শেষ লাইন বা শেষ শব্দ লিখার সময়ে এই কলম ব্যবহার করবে।

আমি অবাক হয়ে তাকাতেই, নিজের কথার কারণ ব্যাখ্যা করলেন,"তোমার প্রিয় শিক্ষিকা কানিজ আপা তোমাকে ছোটবেলা থেকে কত স্নেহ করেন, জানো তো! তিনি দোয়া পড়ে এই কলমে ফুঁ দিয়ে দিয়েছেন!"

আজকের এই পরীক্ষাআম্মার কাছে কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ, আমি টের পেলাম!

এদিকে ভর্তি পরীক্ষার সময়ে অনেক ছেলেমেয়ে তাদের অভিভাবক সহকারে আসবেন। এর ভিতর আমাকে খুঁজে পেতে যেন আম্মার ঝামেলা পোহাতে না হয়, তাই তিনি আমাকে সহজে চোখে পড়বার ব্যবস্থা করেছেন। একটা লাল রঙের শার্ট কিনে দিয়েছেন। শার্টের কলার কালো, আর বুকের ডান পাশে গোল একটা চাকার ছবি, যেখানে ইংরেজিতে কথাবার্তা লিখা! শার্টটা খুব সুন্দর ছিল!

আমি পরীক্ষা হলে ঢুকবার আগেই আশেপাশে তাকিয়ে নিশ্চিত হলাম, আমার মতো লাল শার্ট পরিহিত আর কোন মানুষ নেই!

দীর্ঘ সময় ধরে চলা পরীক্ষা ভালো হলো। আসলে শহীদ স্যার দশ মাস ধরে যে পরিমাণ চর্চা করিয়েছেন, পরীক্ষা ভালো না হয়ে উপায় নেই। পরীক্ষা হল থেকে খুশি মনে বের হয়েছি মাত্র, একজন সিকিউরিটি গার্ড এগিয়ে এসে বললেন,"তোমার আম্মা ঐ যে বিল্ডিংটার পাশের আম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। তুমি যাও।"

আমি অবাক ভাব কাটিয়ে উঠে একটু সামনে এগিয়ে যেতেই,ভিড়ের মাঝে থেকে আরেকজন অভিভাবক আংকেল বললেন, "ঐ যে ওখানে তোমার আম্মা দাঁড়িয়ে আছেন। "

পরীক্ষা শেষে কেন্দ্রের বাইরে অনেক ভিড়। ভিড় ঠেলে আম্মা পর্যন্ত পৌঁছতে আমি মোটামুটি ছয় সাতজনের দিক নির্দেশনা পেয়ে গেছি!

আম্মার কাছে পৌঁছালে তিনি আদর করে দিলেন। পরীক্ষা কেমন হলোজিজ্ঞেস করলেন। আমি ভালো হয়েছে বলাতে মনে হলো একটু বিষণ্ন হলেন। কিন্তু পরক্ষণেই হাসলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাকে অনেক মানুষ বলেছেন না, যে আমি এই জায়গায় অপেক্ষা করছি?"

আমি মাথা ঝাকালাম! আম্মা বিজয়ীর হাসি হেসে বললেন, "আমি সবাইকে বলেছি, ঐ যে লাল শার্ট পড়া ছেলেটা, ঐটা আমার ছেলে। ওকে বলবেন, আমি এখানে অপেক্ষায় আছি!"

একমাত্র ছেলে হওয়ার কারণে আম্মা সবসময়ই চাইতেন, আমি যেন তাঁর কাছেই থাকি। যদিও আমার সীমাহীন দুষ্টুমীর কারণে আমার দাদী এবং আরও অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী আমাকে বোর্ডিং স্কুলে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

ক্যাডেট কলেজ ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবো, এই আত্মবিশ্বাস ছিল। কিন্তু পরীক্ষার সাথে সাথেই তো আর ফলাফল দেয় না। কিছুদিন সময় প্রয়োজন হয়। এই সময়টা খুব বেশি আনন্দের না। কারণ সকলেই সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে উৎকণ্ঠায় থাকে। এই সময়ে আম্মার মাথায় চিন্তা এলো, "আমার ছেলে যদি কোন কারণে ক্যাডেট কলেজে চান্স না পায়, তবে কি হবে!" এই চিন্তা থেকে তিনি আমাকে অন্য কোথাও ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ানোর জন্য পরিকল্পনা করতে লাগলেন। শেষমেশ ঢাকা রেসেডেন্সিয়াল মডেল কলেজের সদ্য শুরু হওয়া নন-রেসিডেন্ট শিফটের জন্য ভর্তি ফর্ম কিনতে সক্ষম হলেন।

আমি অনেক নাটকীয়তার পর শেষ পর্যন্ত ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে সক্ষম হই এবং বিশাল আলোড়ন তুলে চূড়ান্ত সুযোগ পাই। তবে আমার রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের জীবন খুব অল্প দিনের। কারণ কিছুদিন বাদেই আমি ক্যাডেট কলেজের ভর্তি পরীক্ষার

চূড়ান্ত ফলাফলে উত্তীর্ণদের তালিকায় নিজের নাম দেখি। মৌখিক এবং মেডিক্যাল পরীক্ষা শেষে ১৯৯৩ সালের মে মাসের এক বিকালে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের আঙিনায় গিয়ে উপস্থিত হই। সেখান থেকে আমার ক্যাডেট জীবনের যাত্রা শুরু।